

বরেণ্য শিশু-চিকিৎসাবিদ ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সম্মানিত উপদেষ্টা জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান (মোহাম্মদ রফি খান)। বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে কিংবদন্তিসম এ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ৫ নভেম্বর ২০১৬ যাত্রা করেছেন অনন্ত মহাজাগতিক সফরে। ইল্লা লিল্লাহে ... রাজিউন।

ষাটের দশকে চিকিৎসাব্যবস্থায় যখন শিশু চিকিৎসার ন্যূনতম ধারণাটিও এদেশের সর্বমহলে ছিল অনুপস্থিত, তখন ইংল্যান্ড থেকে সদ্য দেশে ফেরা ডা. এম আর খান নিজের সমস্ত বৈষয়িক অর্জনের সম্ভাবনা দূরে সরিয়ে শিশু চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। এতে ঝুঁকি ছিল, কিন্তু শিশুদের প্রতি তার অকৃত্রিম মমত্ববোধ ছিল সে তুলনায় অনেক বেশি। যার ফলে সুদীর্ঘ কয়েক দশকের পথপরিক্রমায় শিশু চিকিৎসায় বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বমানের। এর নেপথ্যে তার ভূমিকা ও কৃতিত্ব চিরস্মরণীয়।

শিশুসুহৃদ এম আর খান প্রকৃত অর্থেই ছিলেন সেবামুখিতা ও অফুরান কর্মোদ্যমের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তার পুরো কর্মজীবনব্যাপী আমরা দেখতে পাই শিশুদের প্রতি, দেশ ও মানুষের প্রতি তার অসামান্য ভালবাসা, মমতা ও স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ববোধ। তাই শিশুদের চিকিৎসা দিয়েই শুধু তিনি তার দায়িত্ব শেষ করেন নি, বরং দেশের বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন একাধিক সেবামুখী প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন শিশুস্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন, শিশুস্বাস্থ্য

ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। পেনশনের পুরো অর্থ দিয়ে গড়ে তুলেছেন ডা. এম আর খান-আনোয়ারা ট্রাস্ট। এর আওতায় দুস্থ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করেছেন তিনি। এছাড়াও গড়ে তুলেছেন সাতক্ষীরা শিশু হাসপাতাল, যশোর শিশু হাসপাতাল, সাতক্ষীরা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল হাসপাতাল, ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতাল, নিবেদিতা নার্সিং হোমসহ একাধিক প্রতিষ্ঠান। দেশ থেকে

পোলিও নির্মূলে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ধূমপানবিরোধী আন্দোলন ‘আধুনিক’-এর সাথে কাজ করেছেন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই।

আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি কোয়ান্টামের প্রতি ডা. এম আর খানের ঐকান্তিক ভালবাসা ও আন্তরিক দোয়া, যার অনন্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি ২০১১ সালের মার্চে। অশীতিপর বয়সে পাহাড়ি রাস্তার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পাঁচ জন সফরসঙ্গীসহ তিনি সেবার গিয়েছিলেন বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম-এ। তার আগমন উপলক্ষে আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্পে তিনি শিশুদের চিকিৎসাসেবা দেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রস্তাবিত ‘কোয়ান্টাম মা ও শিশু হাসপাতাল’-এর।

লামার মতো প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়ার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করলে আল্লাহ মানুষকে সাহায্য করেন। আমি দোয়া করি, কোয়ান্টামের এ বরকতময় উদ্যোগে আল্লাহ যেন

আরো সফলতা দেন।

৮ ও ৯ মার্চ

২০১১-তে

দুদিনব্যাপী এ

সফরে তিনি

আরো

বলেন,

‘আমাদের সমাজে অনেকে আছেন যারা কাজ করেন নিজের সুনাম অথবা আর্থিক সুবিধা লাভের জন্যে। কিন্তু কোয়ান্টামে সব কাজই করা হয় নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকারের নিয়তে। কোয়ান্টামের এ দর্শন আমার খুব ভালো লাগে।’

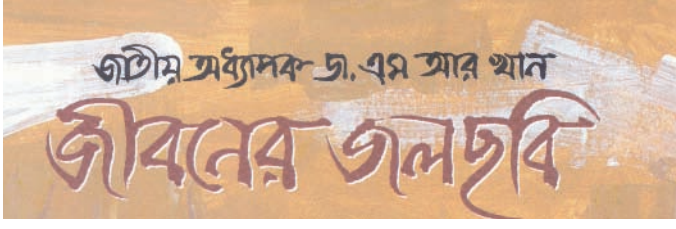
শিশু চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদানের জন্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একটি শিক্ষার্থী আবাসন তার নামে নামকরণ করা হয় এবং তিনি স্বহস্তে এর নামফলক উন্মোচন করেন।

সেইবার লামা সফরে তিনি অনুভব করেন কোয়ান্টাম সৎলগ্ন কিছু যোগাযোগ-প্রতিবন্ধকতা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা। পরে ঢাকায় ফিরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ থেকে শুরু করে এর প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি তিনি ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করেন। এর ফলে ২০১৩ সালে এলজিইডির উদ্যোগে লামায় নির্মিত হয় ৩৬ ফুট দীর্ঘ লম্বাখোলা সেতু এবং ৮৭ ফুট দীর্ঘ কসমো স্কুল সংযোগ সেতু এবং ৪৭৫ ফুট দীর্ঘ স্বাগতায়ন-কসমো আবাসিক সংযোগ সড়ক, যা কোয়ান্টাম-ভ্রমণযাত্রীসহ স্থানীয় জনগণের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরবর্তীতে তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৮ ব্যাচে অংশ নেন এবং আরো দুবার কোয়ান্টাম সফর করেন। ২০১৪ সালে কোয়ান্টাম-এর নবনির্মিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ‘শাফিয়ান’ ও ‘ডা. এম আর খান শিশু ওয়ার্ড’-এর উদ্বোধন করেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি কোয়ান্টাম-এ অনুষ্ঠিত মেডিকেল ক্যাম্পটি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তার স্মরণে উৎসর্গ করেছে। আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান স্মরণে বিশেষ সংখ্যা



রাইট। এরপর ওখানে তার সুনাম আরো বেড়ে যায়। বোল্টনের ব্রিটিশ রোগীরা সুস্থ হওয়ার পর পরিচিতদের বলতেন, অসুস্থ হলে এ হাসপাতালে যাবেন। ওখানে ডা. খান আছেন, তিনি রোগীদের প্রতি খুবই যত্নবান।

এভাবেই সমস্রমী সেবাদানের গুণে বিদেশি চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও ডা. খান অন্তর্মুখী ব্রিটিশদের আপনজনে পরিণত হন। তার গুণমুগ্ধদের একজন ছিলেন বিশ্বখ্যাত সার্জন প্রফেসর ডা. হ্যামিল্টন বেলি (পৃথিবীব্যাপী সুপরিচিত সার্জারির পাঠ্যবই ক্লিনিক্যাল মেথডস ইন সার্জারি ও হ্যান্ডবুক অব সার্জারি-র লেখক)।

অতঃপর ১৯৬৩ সালে তিনি এমআরসিপি ডিগ্রি অর্জন করেন। বিলেতে তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল ততদিনে তা স্পষ্ট। জ্যেষ্ঠ সহকর্মী ও অধ্যাপকরা তাকে ইংল্যান্ডে থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ডা. খান তাদের বললেন, ‘আমার মতো লোক তোমাদের দেশে হাজার জন আছে। কিন্তু আমার দেশে তো খুব কম।’ মাটির টানে তাই দেশে ফিরে এলেন তিনি।

স্বদেশে শিশু চিকিৎসার অগ্রপথিক

১৯৬৩ সাল পর্যন্ত শিশু চিকিৎসার ব্যাপারে এদেশের মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। জেনারেল মেডিসিনের ডাক্তারের কাছেই নিয়ে যাওয়া হতো শিশুদের। পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্ট ছিল কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। তাই বিলেতের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের পরও এম আর খানের যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না।

নিরন্তর প্রয়াস ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে তিনি দেশবাসীকে সচেতন করে তোলেন। রাজশাহী অঞ্চলে শিশু চিকিৎসার সূচনা ঘটে তারই হাতে। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে পোলিও, ডিপথেরিয়া ও টিটেনাস ভ্যাকসিন প্রয়োগের সূচনা করেন তিনি। গড়ে তোলেন একাধিক শিশু হাসপাতাল। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে তিনিই পেডিয়াট্রিকস-এর প্রথম অধ্যাপক।

দেশে প্রচুর সংখ্যক দক্ষ শিশু চিকিৎসক তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭০ সালে তিনি পেডিয়াট্রিকস বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন তৎকালীন আইপিজেএমআর-এ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ, পেডিয়াট্রিকস-এ এমসিপিএস ও এফসিপিএস ডিগ্রি প্রবর্তনও তার নেপথ্য অবদান।

শিশু-চিকিৎসার পথিকৃৎ হিসেবে তার অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাকে ‘জাতীয় অধ্যাপক’ নিয়োগ করে। এছাড়াও একশে পদক, স্বাধীনতা পদক, বিএসএমএমইউ স্বর্ণপদক, আন্তর্জাতিক ম্যানিলা অ্যাওয়ার্ডসহ দেশে-বিদেশে বহু উল্লেখযোগ্য সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন।

মানবতায় বিশ্বাসী চির উদ্যমী

১৯৮৮ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন ডা. এম আর খান। বিদায়দিনে ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘ডাক্তারদের চেষ্টা করতে হবে রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজনের কাছে রোগীর প্রকৃত সমস্যাটি তুলে ধরা।

আপনারা এমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন যেন রোগী মারা গেলেও তার আত্মীয়স্বজনরা বলে যে, হায়াত নেই তাই মারা গেছে। ডাক্তার সাহেব চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি।’

অবসরের পর ডা. খান আরো বিস্তৃত করেন তার কাজের পরিধি। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘সময় কই যে বিশ্রাম নেব। বিশ্রাম নেব একবারই। শেষ বিশ্রাম।’

সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে তিনি সবসময় সাধ্যমতো বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত।

কারণ ডা. এম আর খান বিশ্বাস করতেন-‘মানুষে মানুষে স্নেহ-মমতার সম্পর্ক মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সে-জন্যেই বিশ্বব্যাপী এত যুদ্ধোত্তাপ থাকা সত্ত্বেও মানবসমাজ টিকে আছে ও থাকবে।’

১৯৫৪ সাল। সদ্য এমবিবিএস পাশ তরুণ চিকিৎসক এম আর খান প্র্যাকটিস শুরু করেছেন নিজের এলাকা সাতক্ষীরা শহরে। একদিন সাইকেল চালিয়ে তাকে যেতে হলো আট মাইল দূরে এক রোগীর বাড়িতে। সময়সাপেক্ষ চিকিৎসার পর রোগী ফি দিতে চাইল দুই টাকা, যদিও কম্পাউন্ডার আগেই আট টাকায় রফা করেছিল। তাই সে পুরো ফি আদায়ের জন্যে রোগীকে নানাভাবে বলতে লাগল। ডা. খান তখন কম্পাউন্ডারকে নিবৃত্ত করে বললেন, ওরা গরিব মানুষ। তুমি বরং ওই দুই টাকাও ফিরিয়ে দাও।

মানুষের প্রতি জীবনভর এই মমতা ও উদারতার জন্যেই ডা. এম আর খান পরিণত হয়েছেন এদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে এক কিংবদন্তিতে।

আনন্দময় শৈশব তার বিকশিত হবার ভিত্তি

১৯২৮ সালের ১ আগস্ট সাতক্ষীরার রসুলপুর গ্রামে এক সচ্ছল ও বিদ্যানুরাগী পরিবারে এম আর খানের জন্ম। তার শৈশবের বর্ণনা হতে পারে একালের অভিভাবকদের জন্যে অনুসরণীয়। তার জবানিতে-‘আমার ছেলেবেলা ছিল স্বপ্নের মতো। এখন তো ক্ষুদ্রে শিক্ষার্থীদের ক্ষুদ্রে ভর্তির পরপরই একগাদা বই-খাতা চাপিয়ে দেয়া হয়। সে-সময় আমাদের পড়ালেখার চাপ এতটা ছিল না। সন্ধ্যার পরে আর সকালে একটু পড়া। ব্যস, নিত্যদিনকার পড়া মুখস্থ করে ফেলতাম সহজেই। আমাদের কাছে সেই পড়ালেখা ভয়ানক একটা বোঝা বলে মনে হতো না। সারাদিন খেলতাম, দৌড়াতাম।’

অভিভাবকদের প্রতি তাই শিশুবন্ধুর পরামর্শ-‘শিশুদের বইয়ের ভাণ্ডার কুঁজো করে ফেলবেন না। ওদের বিনোদনের সুযোগ দিন। ওরা সুস্থ থাকবে।’

কৃতি শিক্ষার্থী ও সফল শিক্ষাজীবন

শাগিত মেধা, জানার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ ও নিরলস পরিশ্রমই এম আর খানের সফল শিক্ষাজীবনের মূল রহস্য। সাতক্ষীরার প্রাণনাথ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সালে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৪৫ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। এমবিবিএস সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি সাতক্ষীরায় প্র্যাকটিস করার সিদ্ধান্ত নেন।

ডা. এম আর খান ছিলেন তৎকালীন সাতক্ষীরা মহকুমার প্রথম এমবিবিএস ডাক্তার। তাই পাশ করে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ সালে তাকে বরণ করে নিতে শহরের অধিবাসীরা গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। পেশাগত দক্ষতা ও অমায়িক ব্যবহারের কারণে দ্রুতই তিনি শহরবাসীর হৃদয় জয় করে নেন। বছর কয়েক পর চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে পাড়ি জমান বিলেতের উদ্দেশ্যে।

১৯৫৭ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডা. খান ‘ডিপ্লোমা ইন ট্রিপিক্যাল মেডিসিন এন্ড হাইজিন’ ডিগ্রি লাভ করেন। গোটা পাকিস্তানে তখন এই ডিগ্রিধারী ডাক্তারের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। পরের বছর তিনি লন্ডন স্কুল অব মেডিসিন থেকে ‘ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ’ অর্জন করেন। এ-ও ছিল বিরল কৃতিত্ব। কেননা, সে-সময় এই পরীক্ষায় অংশ নেয়া চিকিৎসকদের শতকরা মাত্র ১৫ জন কৃতকার্য হতেন।

বিলেতের মাটিতে বাঙালি ধ্বস্তরি

এরপর এমআরসিপি পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ব্রিটেনের কয়েকটি হাসপাতালে তিনি কাজ করেন। সেখানেও তিনি পরিচয় দেন ঈর্ষণীয় দক্ষতার। বোল্টন হাসপাতালে একবার স্কিন র্যাশ নিয়ে একটি শিশু ভর্তি হলো। ডা. খান ধারণা করলেন শিশুটি স্কারলেট ফিভার-এ আক্রান্ত। তিনি পেনিসিলিন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু অন্য ডাক্তাররা বাধ সাধলেন। তাদের ধারণা শিশুটির হাম হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা পর শিশুটি মারা গেল।

যথার্থি সরকারিভাবে বিশদ তদন্ত হলো। রিপোর্টে দেখা গেল, ডা. খানের পরামর্শ অনুসরণ করলে শিশুটিকে বাঁচানো যেত। বোল্টন ইভনিং নিউজ পত্রিকা প্রধান শিরোনাম করল-‘দ্য বেবি ডায়েড আনইয়ুজুয়াল ডেথ এন্ড ডক্টর খান ওয়াজ

যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজিয়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ

তোমরাও যোগ দিয়ে জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতাংশ, ডা. এম আর
খানের আত্মজীবনী ‘জীবনের জলছবি’র ভূমিকা থেকে।

নিরাময় ও ইতিবাচকতার কার্যকর দিক-নির্দেশনা দেয় কোয়ান্টাম

আমাদের যত রোগ তার শতকরা ৭৫ ভাগই মনোদৈহিক। তাই অনেক সময় শুধু ওষুধ দিলেই রোগী ভালো হয় না। আমার ধারণা, রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হলো আস্থা। কোয়ান্টাম কোর্সে আপনারা যে ৪০ ঘণ্টা ধরে গুরুজীর কথা শুনেছেন এবং অনেকেই নানারকম রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন—এর মূলে রয়েছে গুরুজী ও কোয়ান্টামের প্রতি আপনাদের আস্থা ও বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসই মানুষকে নিরাময় করে ও ইতিবাচক শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করে।

১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ২০১১-তে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩২৮ ব্যাচের প্রত্যয়নে একথা বলেন বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ ও শিশুবন্ধু ডা. এম আর খান।

নানা ব্যস্ততা আর কাজের মধ্যেও কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করেন অশীতিপর এ চিকিৎসক। তিনি বলেন, শেখার কোনো শেষ নেই, শেখার কোনো বয়স নেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একজন মানুষ শিখতে পারে। তাই এ কোর্সের ৩২৮ তম ব্যাচে আপনাদের মাঝে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। হল ভর্তি এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে টানা চার দিন শুধু কথার মাধ্যমে গুরুজী কী চমৎকারভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন—এটি সত্যিই আমার খুব অবাক লাগছে।

একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে আমার বিশ্বাস—আল্লাহ, রসুল এবং অন্যান্য সকল ধর্মে মানবকল্যাণের যে কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমানকালের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ রয়েছে। এ কারণেই কোয়ান্টাম কোর্সে গুরুজীর আলোচিত কথাগুলো, যেমন শুকরিয়ার গুরুত্ব, আল্লাহ ও রসুলের কথা এবং প্রত্যেক ধর্মের

মানবপ্রেমের বাণী আমাকে খুব মোহিত করেছে। আমি মনে করি, এটি শতভাগ ধর্মসম্মত।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মানুষ বলে আমি জানি, আমাদের মস্তিষ্কে যে লক্ষ কোটি নিউরোন রয়েছে, তার অনেকাংশই আমরা ব্যবহার করি না; কিন্তু এগুলোকে কীভাবে উজ্জীবিত করতে হয়, কাজে লাগাতে হয়—গুরুজী তা চমৎকার



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ধ্যানমগ্ন ডা. এম আর খান

বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই আমি বলব, সব ধরনের নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হয়ে একজন ইতিবাচক মানুষ হয়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা রয়েছে কোয়ান্টামে। আমি বিশ্বাস করি, এ কোর্স আবহমান কাল ধরে চলতে থাকবে এবং আরো অগণিত মানুষ কোয়ান্টামের মাধ্যমে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হবে।

কিছুদিন আগে আমাদের সুযোগ হয়েছিল লামার শিশুকানন দেখার। সেখানে শিশুদের সাথে আমি গল্প করেছি, সুন্দর সময় কাটিয়েছি। এত সুন্দর আর প্রাণবন্ত একেকটি ফুটফুটে শিশু। আপনারাও যাবেন এবং দেখবেন। তারা প্রত্যেকে যেন স্বর্গের একেকটি ফুল। কবিগুরুর ভাষায়—ইহাদের করো আশীর্বাদ // ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ প্রাণগুলি, / নন্দনের এনেছে সম্মাদ। গুরুজী, মা-জী এবং কোয়ান্টামের সবাই তাদের ভালবেসে আপন করে নিয়েছেন নিজেদের সন্তানের মতো।

এ শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের যাকাতের একটি অংশ এখানে দিতে পারি, মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতে পারি। কারণ যিনি ভালো কাজ করছেন তার কাজে সাহায্য করলে মানুষ উপকৃত হবে। আর ভালো কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা সবাই সওয়াবের অংশীদার হতে পারি। ইতোমধ্যেই লামায় শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি।

পরিশেষে তিনি বলেন, ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ’ ও ‘বদলে গেছে লাখো জীবন’—কোয়ান্টামের এই দুটো কথা আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। টানা চার দিন ধরে গুরুজী আসলে আমাদেরকে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন এবং সফলভাবে সবার মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আত্ম উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে লক্ষ মানুষের জীবন বদলে যাচ্ছে। এজন্যে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া জানানোর পাশাপাশি আমি গুরুজী, মা-জী এবং কোয়ান্টামের সব সদস্যের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আপনাদের সবার জন্যে এই দোয়াই করি, যেন এ বরকতময় কাজে আল্লাহ আরো সফলতা দেন।

১২ জুলাই ২০০৫ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় আমন্ত্রিত হন জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। ভালো মানুষ হওয়ার গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনায় তিনি বলেন, একটি সময় ছিল যখন ডাক্তার দেখলে মানুষ শ্রদ্ধাবনত হয়ে যেত। কিন্তু এখন আর সে সম্মান নেই। এজন্যে তিনি কিছু ডাক্তারের ব্যবসা-মানসিকতাকেই দায়ী করেন।

একজন সত্যিকার ডাক্তারের কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি কী কী গুণ থাকা উচিত তার উত্তরে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, সিমপ্যাথি এবং এমপ্যাথি। অর্থাৎ সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা। এ দুটো ছাড়া সেবার কাজটি পরিপূর্ণ হয় না। প্রভুই একমাত্র নিরাময়কারী। ডাক্তার বা ওষুধ এক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি মাত্র। তারপরও একজন ডাক্তার হিসেবে রোগীর জন্যে যতটুকু করণীয় তাতে কারো অবহেলা

করা উচিত নয়। তা করলে একদিকে যেমন বিবেকের কাছে, অন্যদিকে সমাজ ও প্রষ্টার কাছেও তার দায়বদ্ধতা থেকে যাবে।

তিনি আরো বলেন, শুধু পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। এর সাথে যখন নৈতিক ও মানবিক শক্তি যুক্ত হয় তখনই একজনকে ভালো মানুষ বলা যায়। সহজ করে বলা যায়, ভালো মানুষ তিনিই যার দ্বারা কারো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। আচার-আচরণ, কথাসহ দৈনন্দিন সবকিছুতে যার চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে।

আসলে শান্তি দিয়ে, মেরে কখনো কাউকে ভালো করা যায় না। মানুষের মনে ভালো হওয়ার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। কেননা একা একা ভালো থাকা যায় না। চারপাশের সবাইকে অর্থ দিয়ে বা সং পরামর্শ দিয়ে আলোকিত মানুষ হতে সাহায্য করতে হবে।

এই আলোকিত মানুষেরা যদি দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে অন্যদের আলোকিত করেন তাহলে আগামী ১০ বছরে দেশটা অনেক এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কোয়ান্টামে শিশুবন্ধু ডা. এম আর খান



২০১১ সালের ৮ মার্চ পাঁচ জন সফরসঙ্গী নিয়ে প্রথমবারের মতো বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম সফর করেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। এরপর ২০১৩ ও ২০১৪-তে তিনি আরো দুবার কোয়ান্টামে এসেছেন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিশুদের টানে।

স্কুলের যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন সংযোগ সেতু নির্মাণের। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন কোয়ান্টাদের জন্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও।

এ শিশুদের তিনি আপন করে নিয়েছেন খুব সহজেই। সদা হাস্যোজ্জ্বল এ মানুষটির সান্নিধ্য শিশুদের জন্যে হয়ে থাকবে আনন্দ ও অনুপ্রেরণার অম্লান উৎস।

বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে অনন্য অবদান রাখা এ মানুষটি সবসময় কোয়ান্টামের পাশে থেকেছেন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে।



প্রস্তাবিত কোয়ান্টাম মা ও শিশু হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে দোয়া



শাফিয়ানের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করছেন



কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের পাহাড়ি, বাঙালি ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীদের সাথে

এই শিশুরাই একদিন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান

কোয়ান্টাম-এ এসে যখন ফুলের মতো এতগুলো শিশুকে একসাথে দেখি, আমার প্রাণটা সত্যিই ভরে যায়। খুব ভালো লাগে।

সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে একাধিক বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা এখানে একত্রে একটি আলোকিত পরিবেশে বেড়ে উঠছে। আমি মনে করি, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি অনন্য উদাহরণ এটি।

আমাদের সমাজ ও দেশের একটি সুন্দর ও উন্নত ভবিষ্যৎ আমি এই শিশুদের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। আলোকিত শিক্ষা ও সঠিক জীবনদর্শনে জেগে উঠে একদিন ওরাই তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাতিকে নেতৃত্ব দেবে।

এর পাশাপাশি আমি জানি, তারা দেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও প্রথমসারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। শুধু তা-ই নয়, লেখাপড়ায় ভালো করার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাদের ঈর্ষণীয় সাফল্য কোয়ান্টাম পরিবারের গৌরব বাড়িয়েছে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

এদের খেলার মাঠের এক জায়গায় লেখা আছে দেখছি-অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই। সেই প্রত্যাশাই করি-অলিম্পিকে একদিন আমরা অবশ্যই সোনা জিতব।

সত্যিকার অর্থেই এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা সোনার মানুষ হোক। আলোকিত মানুষ হোক। ওরা যে জাতিগোষ্ঠী থেকেই আসুক না কেন, সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পড়াশোনা, খেলাধুলা ও অন্যান্য সবক্ষেত্রে এগিয়ে যাক। আরো বড় সাফল্য অর্জন করুক। পরিবার, সমাজ এবং দেশের জন্যে সম্মান বয়ে আনুক। আমি ওদের জন্যে এই দোয়াই করি।



কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ানে 'শিশুবন্ধু ডা. এম আর খান ওয়ার্ড' উদ্বোধনের মুহূর্তে



একজন স্কুদে কোয়ান্টামের সাথে, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে



কোয়ান্টামের
পরিবেশনায়
মনোজ্ঞ
সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান
উপভোগ
করছেন
ডা. এম আর খান
ও বিশিষ্ট
পরমাণু বিজ্ঞানী
ড. এম শমশের
আলী



কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সংযোগ পথে নির্মিত কালভার্ট উদ্বোধনের পর প্রার্থনারত

শিশুকে স্বনির্ভর ও পরিশ্রমী করে গড়ে তুলুন

ডা. এম আর খান



শিশুদের নিয়ে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। তারা আনন্দ পেলে হাসে, ব্যথায় কাঁদে। তাদের মন সরল ও অকৃত্রিম। তারা অনেক সময় তাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা বোঝাতে পারে না। তাই তাদের জন্যে সবসময় ভালো কিছু করার চেষ্টা করি। নিয়ত থাকে শিশুদের সেবা করার এবং বিশ্বাস করি আল্লাহ সাহায্য করবেন। আমার হাতযশের রহস্য আসলে এটাই।

শিশুদের নিয়ে বর্তমান যুগের মা-বাবাদের অনেক সমস্যা। প্রত্যেক মা-বাবাই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন এবং সবাই চান তার সন্তান সর্বক্ষেত্রে নাখার ওয়ান হবে। কিন্তু ফাস্ট তো সবসময় একজনই হয়, তিন জন তো আর হয় না। সুতরাং যে শিশু অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে সবাইকেই তার মতো হতে হবে—এ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই বাবা-মায়েরা শিশুদের জীবনে টেনশন সৃষ্টি করেন এবং নিজেরাও অশান্তিতে ভোগেন।

একটি শিশু যে শুধু লেখাপড়ায় ভালো হবে তা নয়। তার আর্টে দক্ষতা থাকতে পারে। কবিতা কিংবা খেলাধুলায় দক্ষতা থাকতে পারে। সবাইকেই ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে কেন? আল্লাহ তায়ালা একেকজনকে একেকভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে, এটা তো ঠিক নয়। উচিতও নয়। তাহলে আমরা নজরুলও পেতাম না, রবীন্দ্রনাথও পেতাম না, জসীম উদ্দীনও পেতাম না। কিন্তু এদেরকেও প্রয়োজন আছে আমাদের সবার।

শিশুরা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একটি শিশুর ভালো ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা গেলে পরবর্তীতে একজন সফল মানুষ, ভালো মানুষের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এজন্যে কৌটা দুধ ও ফাস্টফুড সংস্কৃতি পরিহার করে শিশুকে প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব প্রত্যেক মা-বাবার।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শারীরিক শ্রম। সন্তানকে সারাক্ষণ ননির পুতুলের মতো আগলে না রেখে তাকে স্বনির্ভর ও তার সাধ্যমতো শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। শিশুদের পরিপূর্ণ শারীরিক মানসিক সুস্থতার সাথে গড়ে তুলতে চাইলে এ বিষয়গুলো অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে সাইকোসোম্যাটিক রোগগুলো যে এত বেশি দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হলো স্ট্রেস ডিজ-অর্ডার বা মানসিক চাপ সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। এটা আগে ছিল না। তখন আমাদের মন সং ও কল্যাণ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আমাদের শৈশবে মানুষের এত চাহিদা ছিল না। চাহিদার পেছনে আমরা এত দৌড়াইতামও না। অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতাম। তাই ভালো থাকতাম।

কেউ এ বয়সে আমার সুস্থতার রহস্য জানতে চাইলে আমি বলি, রহস্য একটাই—নিয়মিতাঙ্গিক জীবনযাপন এবং সংচিন্তা, ভালো চিন্তা। সবার ভালো চিন্তা করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আমার শত্রুও ভালো থাকুক। সংচিন্তা থাকলে জীবনে কোনো টেনশন থাকে না এবং ভালো থাকা যায়। আমি এটাই সবসময় মনে চলার চেষ্টা করি।

আমি সবসময় রাগ-ক্ষোভ থেকে দূরে থাকি। কখনো যদি রাগ আসতে চায় আমি চুপ হয়ে যাই। কারণ রেগে গেলে শরীরে এড্রিনালিন নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়, যার অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। তাই রাগ বর্জন করা গেলে স্ট্রেসের কারণে সৃষ্ট রোগগুলো থেকে এমনিতেই মুক্ত থাকা বাবে।

আর যিনি রাগ বর্জন করতে পেরেছেন তিনি একজন সার্থক মানুষ এবং সত্যিকারের সাধক। কারণ রাজ্য জয় করা কঠিন, কিন্তু রাগ জয় করা আরও কঠিন।

মানুষের অসুস্থতার যে অনুভূতি, তার উৎস মূলত ব্রেন। ব্রেনের বিভিন্ন ওয়েভ এ অনুভূতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন কোনো অসুখ হয় তখন ব্রেনে তার প্রতিফলন ঘটে এবং এর প্রভাব শরীরে চলে আসে। তাই ব্রেনটাকে যদি সুস্থ রাখা যায় তাহলে সবই সুস্থ থাকে। আর ব্রেনকে সুস্থ রাখতে গেলে মেডিটেশন প্রয়োজন। এটি এখন আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থিত যে, মেডিটেশন আমাদের ব্রেনকে চমৎকারভাবে প্রভাবিত করে।

ব্রেনকে যদি আমরা পরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে জীবনটা অনেক সুন্দর ও সহজ হয়ে যায়। এটি মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে সম্ভব। মেডিটেশনের মাধ্যমে একজন মানুষ যদি তার ব্রেন ওয়েভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে তিনি মনোদৈহিক সুস্থতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। এটা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত একটি সত্য।

উচ্চ রক্তচাপ, এজমা, এলার্জি, একজিমা ইত্যাদি রোগগুলো মূলত সাইকোসোম্যাটিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সারাজীবন ওষুধ খেয়েও এ রোগগুলো পুরোপুরি ভালো হয় না। কিন্তু মেডিটেশনের মাধ্যমে ব্রেনকে প্রভাবিত করে এ থেকে পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। মেডিটেশন ও জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরাময় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায়।

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন—এটা সব মানুষেরই কাম্য। কথাটা সত্যিই খুব চমৎকার। শুনতেও খুব ভালো লাগে। এটা অর্জনের জন্যে আমাদের সচেতনভাবে চেষ্টা করা উচিত। সুস্থ থাকা, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা এবং কর্মোদ্দীপ্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে আমাদের সবাইকে। তাহলেই আমরা সুস্থ থাকব। আর সেইসাথে বিপুল নিয়তে কোনো কাজ শুরু করলে আল্লাহও সাহায্য করেন।

মাটির ব্যাংক ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অসংখ্য মানুষকে সৎদানে উদ্বুদ্ধ করছে। আসলে আমাদের সবারই সামর্থ্য রয়েছে। কেউ পাঁচ টাকা দিতে পারে, কেউ পাঁচ পয়সা দিতে পারে।

এই পাঁচ পয়সাই সবার সম্মিলিত দানে একসময় কয়েক কোটি টাকায় পরিণত হয়। তাই কোয়ান্টামের এ প্রচেষ্টা সার্থক ও শুভ।

ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোনো বড় কাজ করা যায় না। আমরা কেন ভিক্ষা করব? আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন তা আমরা কাজে লাগাই না কেন? কোয়ান্টাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে স্ব-অর্থায়নে সব কাজ করছে—এটা আমার খুব ভালো লাগে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের অনুভূতি আমি শুনেছি, পড়েছি। এখানে এসে অসংখ্য মানুষ সুস্থতা ও নিরাময় লাভ করছেন। উপকৃত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

আমি বিশ্বাস করি, এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আরো হাজারো মানুষ সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে এগিয়ে যাবেন। কোয়ান্টামের এ যাত্রা শুভ হোক সার্থক হোক—করণাময়ের কাছে এ প্রার্থনা করি।

৬ ব্রেনকে যদি আমরা পরিকল্পিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে জীবনটা অনেক সুন্দর ও সহজ হয়ে যায়। এটি মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে সম্ভব। মেডিটেশনের মাধ্যমে একজন মানুষ যদি তার ব্রেন ওয়েভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে তিনি মনোদৈহিক সুস্থতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। এটা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত একটি সত্য। ৭

ডা. এম আর খান ॥ ফাউন্ডেশনের পাশে সবসময়



২০১১ সাল থেকে প্রতিবছরই এসেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সাথে ঈদ উদ্‌যাপনে



কোয়ান্টাম ল্যাব পরিদর্শন করছেন, জুলাই ২০০৫



কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত সিলভার ও গোল্ডেন ডোনার সম্মাননা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর সঙ্গে, ১৭ জুন ২০১১



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক সেমিনারে' জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব) ডা. আব্দুল মালিক-এর সঙ্গে, ১৯ অক্টোবর ২০১২



নিরাপদ ও বিশুদ্ধ রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ে ফাউন্ডেশন আয়োজিত সায়েন্টিফিক সেমিনারে প্রধান অতিথি ডা. এম আর খান, ২৪ এপ্রিল ২০০৮

কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম

স্বাস্থ্যচেতনা বিস্তার ও স্বাস্থ্যসেবায় কোয়ান্টাম

গত দু-যুগ ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যচেতনা বিস্তারের কাজ করে চলেছে। সেইসাথে উপস্থাপন করেছে সুস্থতার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা। এর পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের সদস্যদের দানে ও সহযোগিতায় ব্যবস্থা করেছে দুর্গত ও অসহায় মানুষের মাঝে সাধ্যমতো স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার কাজ।

ফাউন্ডেশনের এ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে দেশজুড়ে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও ঢাকায় কোয়ান্টাম ল্যাব, নিয়মিত মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা। এ পর্যন্ত দুস্থ পরিবারের ১,৫০,৯৩০ জন শিশু-কিশোর-তরুণকে দেয়া হয়েছে খতনা সেবা।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের অধীনে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, চিকিৎসা, ওষুধ, নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা ও প্রসব-পরবর্তী পরামর্শ ও সেবা পেয়েছেন এ পর্যন্ত ৩,৪৫১ জন সুবিধাবঞ্চিত গর্ভবতী মা।

পাহাড়ি জনপদে আধুনিক চিকিৎসাসেবা

২০০০ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বান্দরবানের লামায় চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। এতে ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবী ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তৎকালীন চিকিৎসক ডা. মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা বিশেষত ম্যালেরিয়ার সর্বাধুনিক, দ্রুত ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেয়ার কাজটি গতি লাভ করে।

উল্লেখ্য, এ অঞ্চলে সেবাদানকারী তিনিই ছিলেন তখন পর্যন্ত একমাত্র এমবিবিএস চিকিৎসক। সে-সময় একেকটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হতো সুদীর্ঘ ৪০ দিনব্যাপী।

শাফিয়ান ৯ স্বাস্থ্যসেবায় বঞ্চিতের সহায়

নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে লামার কোয়ান্টামে ২৪ ঘণ্টা জরুরি চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র ‘শাফিয়ান’। কোয়ান্টামের কর্মীরাহ স্থানীয় পাহাড়ি বাঙালি অধিবাসীরা এখান থেকে সপ্তাহের প্রতিদিনই প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক এবং প্রতি শুক্রবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছেন।

এছাড়াও কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মেডিকেল ক্যাম্পগুলোতে চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছেন বিপুল সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে এমনকি তিন/ চার ঘণ্টার হাঁটা পথ পাড়ি দিয়ে নারী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধরা আসেন। এভাবেই পাহাড়ি জনপদের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সহায় ও ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে শাফিয়ান।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

দেড় দশকের বেশি সময় ধরে নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণে নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের কোয়ান্টাম ল্যাব বর্তমানে সরবরাহ করছে রক্তের আটটি উপাদান। প্রতিদিন গড়ে ২৬১ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা হয়। মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে এখানে সারাবছর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা যে-কেউ এ সেবা নিতে পারেন।

এ পর্যন্ত কোয়ান্টামের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২,৮৬৭টি ব্লাডক্যাম্প। কোয়ান্টাম ল্যাব ও ক্যাম্প মিলিয়ে রক্ত সংগৃহীত হয়েছে মোট ৫,৫৬,৫৭৩ ইউনিট। মোট সরবরাহ করা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানের ৮,৩৭,৮৬৭ ইউনিট বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান।

২০১৬ সালে সীমিত সামর্থ্যবানদের জন্যে

ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে ৮০০৪ ইউনিট এবং সামর্থ্যহীনদের জন্যে বিনা প্রসেসিং খরচে সরবরাহ করা হয়েছে ১৭৬১ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিরলস প্রচেষ্টায় কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে ২,৮৬,৩৬৯ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার ডোনার পুল।

ডা. এম আর খান স্মরণে মেডিকেল ক্যাম্প



৮ মার্চ ২০১১ কোয়ান্টামে আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্পে

বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমস্থ শাফিয়ানে আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি ২০১৭ অনুষ্ঠিতব্য মেডিকেল ক্যাম্পটি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসকবৃন্দ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করবেন। সেইসাথে রোগীদের মাঝে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও বিতরণ করা হবে।



২৫ জানুয়ারি ২০১৩-তে বরণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম স্মরণে কোয়ান্টামে অনুষ্ঠিত মেডিকেল ক্যাম্পে ১৩২ জন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ পান ২,৯০৫ জন রোগী। আর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ভাষাশহীদ স্মরণে শাফিয়ানে অনুষ্ঠিত মেডিকেল ক্যাম্পে ৯৩ জন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ৬৬,৭৬৬ ইউনিট ওষুধ পান ৪,২১৯ জন রোগী।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৬ ৯ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ৯ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ৯ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd